في رؤية الهلال

চাঁদ দেখা প্রসঙ্গে

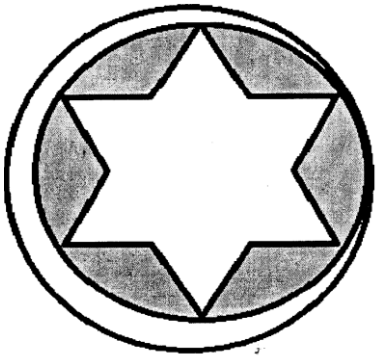

শায়েখ আব্দুল্লাহ্ আল মুনীর

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد.....

রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন,

إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلاَثِينَ يَوْمًا

যখন তোমরা নতুন চাঁদ দেখো তখন রোজা রাখ। আবার যখন নতুন চাঁদ দেখো তখন রোজা রাখা বন্ধ রাখো। যদি আকাশে মেঘ থাকে তবে ত্রিশ দিন রোজা রাখো। [সহীহ মুসলিম]

অন্য রেওয়ায়েতে এসেছে,

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين

চাঁদ দেখে রোজা রাখ। চাঁদ দেখে রোজা ছাড়ো। যদি কোন কারনে চাঁদ আড়াল হয়ে যায় তবে শা'বান মাসের ত্রিশ দিন পুর্ন করো। [সহীহ বুখারী]

فإن حال بينكم وبينه سحابة أو ظلمة فأكملوا العدة عدة شعبان

যদি মেঘ বা অন্য কোন কিছুর আড়ালে চাঁদ ঢেকে যায় তবে শা'বান মাসের ত্রিশ দিন পুর্ন করো। [নাসাঈ]

إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا هكذا . يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين

আমরা উম্মী জাতি। আমরা লিখিনা, হিসাবও রাখি না। তাছাড়া মাস বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে অর্থাৎ মাস উনত্রিশ দিনও হয় ত্রিশ দিনও হয়। [সহীহ বুখারী]

এই সকল হাদিসে নতুন চাঁদ দেখে রোজা রাখা ও নতুন চাঁদ দেখে রোজা ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যদি মেঘ বা অন্য কোন কারনে চাঁদ দেখা সম্ভব না হয় তবে চলতি মাস ত্রিশ দিন পুর্ন করার বিধান দেওয়া হয়েছে। কোনরুপ বৈজ্ঞানিক হিসাব নিকাশ বা চিন্তা গবেষনার উপর বিষয়টি ছেড়ে দেওয়া হয়নি। এমনকি আকাশ মেঘে ঢেকে গেলেও চাঁদের অবস্থান সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক হিসাব নিকাশের আলোকে চিন্তা-গবেষনা করার আদেশ দেওয়া হয়নি। বরং স্পষ্ট ঘোষনা করা হয়েছে, আমরা উম্মী জাতি। আমরা হিসাব নিকাশ বুঝি

না। চাঁদ দেখে রোজা রাখো চাঁদ দেখে রোজা ছাড়ো। আর যদি মেঘে ঢেকে যায় তবে চলতি মাস ত্রিশ দান পুর্ন করো। এবিষয়ে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সমস্ত ওলামায়ে কিরামের মত হলো তারকারাজী বা অন্য কোন প্রকার বৈজ্ঞানিক হিসাব নিকাশের মাধ্যমে রোজা রাখা যাবে না। যতক্ষন না কেউ স্বচক্ষে চাঁদে দেখেছে বলে প্রমানিত হয়। ইবনে কুদামা (র) বলেন,

كذلك لو بنى على قول المنجمين وأهل المعرفة بالحساب فوافق الصواب لم يصح صومه وإن كثرت إصابتهم لأنه ليس بدليل شرعي يجوز البناء عليه ولا العمل به فكان وجوده كعدمه

একইভাবে যদি কেই(চাঁদ না দেখেই)জোতির্বিদ এবং বৈজ্ঞানিক হিসাব-নিকাশের পারদর্শী কারও কথার উপর নির্ভর করে রোজা রাখে এবং পরে প্রমানীত হয় সেটা ঠিকই ছিল(অর্থাৎ পরে প্রমানীত হয় যে উক্ত দিন চাঁদ দেখা গেছে।) তবু তার রোজা শুদ্ধ হবে না। যদিও এই প্রকারের হিসাব-নিকাশ বারবার সঠিক প্রমানিত হয়।কেননা এটা এমন কোনো শারয়ী দলিল-প্রমান নয় যার উপর নির্ভর করা হবে এবং তার উপর আমল

করা হবে। অতএব এটা থাকা বা না থাকা উভয়ই সমান। (আল-মুগনী)

ইমাম নাব্বী (র:) আল-খাত্তাবী ও অন্যান্য ওলামায়ে কিরাম থেকে উল্লেখ করেন,

ومن قال بحساب المنازل فقوله مردود بقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين " إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب

যারা বলে চাঁদের অবস্থান হিসাব করতে হবে তাদের কথা প্রত্যাখ্যাত। কারন বুখারী ও মুসলিমে বর্নিত হাদীসে রসুলুল্লাহ (স:) বলেন, আমরা উম্মী জাতি, আমরা হিসাব করিনা। আমরা লিখিনা। [শারহে মুহাযযাব]

যারা চাঁদের অবস্থান হিসাব-নিকাশ করার পক্ষে তারা একটি হাদীস থেকে দলিল পেশ করে থাকে। রসুলুল্লাহ (স:) বলেন,

إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له

চাঁদ দেখে রোজা রাখো। চাঁদ দেখে রোজা ছাড়ো। আর যদি মেঘ থাকে তবে হিসাব করে নাও। [সহীহ বুখারী]

তারা এই হাদিসে “হিসাব করে নাও” কথাটির অর্থ করেছে বৈজ্ঞানিক হিসাব-নিকাশ। তথা চাঁদের অবস্থান স্থল ও তারকারাজির উপর গবেষণা করা। কিন্তু এখানে হিসাব-নিকাশ বলতে তা বোঝানো হয় নি। অন্য হাদিসে বিষয়টির ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে,

فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ ثَلاَثِينَ

যদি আকাশে মেঘ থাকে তাহলে ত্রিশ দিন হিসাব করে নাও। [সহীহ মুসলিম]

পরের হাদিসটি থেকে বোঝা যায় প্রথম হাদিসটিতে “হিসাব করে নাও” বলতে বৈজ্ঞানিক হিসাব-নিকাশ বোঝানো হয় নি। বরং চলতি মাসের ত্রিশদিন গননা করতে বলা হচ্ছে। যেভাবে অন্যান্য রেওয়ায়েতে স্পষ্ট বলা হয়েছে,

فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلاَثِينَ يَوْمًا

যদি মেঘ থাকে তাহলে ত্রিশদিন রোজা রাখো। [সহীহ মুসলিম]

فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ

যদি চাঁদ কোনো কারনে আড়াল হয়ে যায় তবে শাবান মাস ত্রিশ দিন পূর্ন করো। [নাসায়ী]

সুতারাং এ বিষয়ে এটাই সঠিক যে, রোজা, ঈদ, হজ্জ পালন ইত্যাদি শরয়ী ব্যাপারে কোনো প্রকার বৈজ্ঞানীক হিসাব-নিকাশের উপর নির্ভর করা যাবে না। এসকল বিষয় চাঁদ দেখার উপর নির্ভরশীল। যদি কোনো কারনে চাঁদ দেখা সম্ভব না হয় তবে চলতি মাস ত্রিশ দিন পূর্ন করতে হবে। এটাই রসুল (স:) কর্তৃক নির্ধারিত বিধান। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সকল উলামায়ে কেরামের এটাই মত। চাঁদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো সূর্যের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় নয়। কারন সূর্যের ক্ষেত্রে অবস্থনটিই গুরুত্বপূর্ন। সেটা চোখে দেখা গুরুত্বপূর্ন নয়। যেমন মাগরিবের ছলাত বা ইফতারের সময়ের কথাই ধরা যাক। এই দুটি বিষয় সূর্য ডুবে যাওয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট। বৈজ্ঞানীক হিসাব-নিকাশ বা অন্য কোনোভাবে সূর্য কখন ডুববে সে বিষয়ে নিশ্চিত ধারনা পেলেই কোনো ব্যক্তি মাগরিবের ছলাত আদায় করতে পারে বা সায়েম ইফতার করতে পারে। কেউ নিজ চোখে সূর্যকে ডুবতে দেখেছে কিনা এটা ধর্তব্যের বিষয় নয়। কারন মাগরিবের ছলাত ও ইফতারকে সূর্য ডুবে

যাওয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে। সূর্য ডুবে যাওয়া দেখার সাথে নয়। কিন্তু আরবী মাসের শুরু ও শেষ নির্নয়ের ক্ষেত্রে নতুন চাঁদ মুসলিমদের কেউ না কেউ স্বচক্ষে দেখবে এটা শর্ত করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে চাঁদের অবস্থানের কোনো গুরুত্ব নেই। চাঁদের অবস্থান বলতে কি বোঝায় আমরা একটা চিত্রের সাহায্যে সে বিষয়ে ধারনা পেতে পারি।

ধরা যাক, ABCD বৃত্তটি একটি পৃথিবী এবং EFGHIJ চাঁদের কক্ষপথ। এখন পৃথিবী A থেকে B অভিমুখে অর্থাৎ

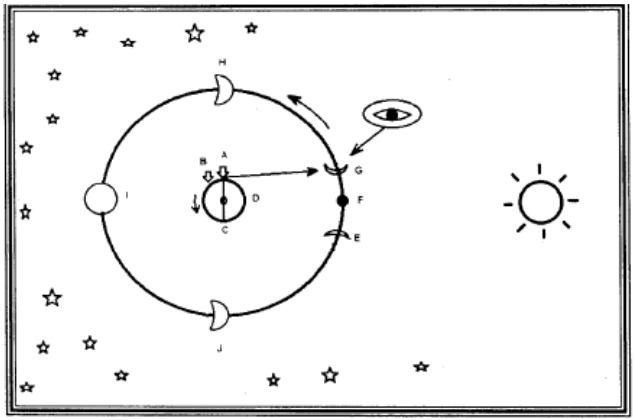

পশ্চিম থেকে পূর্বে ঘুর্নয়নরত এবং চাঁদ তার কক্ষপথে G থেকে H অভীমুখে অর্থাৎ পশ্চিম থেকে পূর্বে দিকে ঘুর্নয়নরত। যদিও আমরা দেখি চাঁদ পূর্বে দিক থেকে ধীরে ধীরে পশ্চিম দিকে সরে আসে। অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে মনে হয় চাঁদ মূলত পূর্ব থেকে পশ্চিমে ঘুর্নয়নরত। আসলে চাঁদের গতি পৃথিবীর গতির তুলনায় কম হওয়ার কারনে দর্শকের নিকট এমন মনে হয়। একই অভীমুখে গতিশীল দুটি ট্রেন পাশাপাশি চললে এবং তাদের একটি অন্যটির চেয়ে কম গতিশীল হলে বেশি গতিশীল সম্পন্ন ট্রেনের যাত্রীদের নিকট মনে হবে অন্য ট্রেনটি পিছনের দিকে যাচ্ছে। চাঁদ ও পৃথিবীর ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটনা ঘটে। অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে মনে হয় চাঁদ পূর্বে থেকে পশ্চিমে সরে যা্চ্ছে। কিন্তু আসলে চাঁদের নিজস্ব গতি পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে। যাই হোক, চাঁদ মোটামুটি ২৯.৫ দিনে পৃথিবীকে একবার পরিভ্রমন করে। কক্ষপথে পরিভ্রমন করার সময় চাঁদের আকৃতি বিভিন্নরকম হয়ে থাকে যা

আমরা আরবী মাসের বিভিন্ন পর্যায়ে সর্বদা লক্ষ্য করি। চিকন সুতার মত বাঁকা চাঁদ দিয়ে আরবী মাস শুরু হয়। যার দুই মুখ থাকে পূর্ব দিকে যেভাবে চিত্রে (G বিন্দুতে) দেখানো হয়েছে। আরবী মাস যতই বাড়তে থাকে চাঁদের আকৃতী ক্রমে বাড়তে বাড়তে ৭/৮ দিনে এসে (চিত্রে H বিন্দুতে) অর্থবৃত্তাকারে রূপ নেয়। ১৪/১৫ দিনে (চিত্রে I বিন্দুতে) পূর্নবৃত্তাকারে ধারন করে। প্রতি মাসে এসময় পূর্নীমা হয়। এর পর চাঁদ আবার কমতে শুরু করে। কিন্তু নতুন চাঁদের ক্ষয়প্রাপ্ত অংশটি যেদিকে ছিল এখন তার বিপরীত দিকে অর্থাৎ পশ্চিম দিকে ক্ষয় শুরু হয়। এভাবে ২২/২৩ দিনে (চিত্রে I বিন্দুতে) চাঁদ পুনরায় ৭/৮ দিনের মত (চিত্রে H বিন্দুতে) অর্ধবৃত্তের আকৃতি ধারন করে। কিন্তু চিত্রে I বিন্দু ও H বিন্দুর মধ্যে পার্থক্য হলো H বিন্দুতে চাঁদ দেখা যায় রাতের আকাশে এবং তার ক্ষয়ে যাওয়া অংশটি থাকে পূর্বে দিকে। অপরদিকে I বিন্দুতে চাঁদ দেখা যায় দিনের আকাশে এবং তার ক্ষয়ে যাওয়া

অংশটি থাকে পশ্চিম দিকে। এভাবে মাসের শেষে (চিত্রে E বিন্দুতে চাঁদ সম্পুর্ন নতুন চাঁদের আকৃতি ধারন করে। কিন্তু পার্থক্য হলো এ চাঁদ দেখা যায় পূর্ব আকাশে সূর্যদয়ের পূর্বে এবং এর ক্ষয়প্রাপ্ত অংশটি থাকে পশ্চিম দিকে। আর নতুন চাঁদ দেখা যায় পশ্চিম আকাশে সূর্যাস্তের পর। আর তার ক্ষয়প্রাপ্ত অংশটি থাকে পূর্ব দিকে। এর পর চাঁদে যখন সম্পুর্ন সূর্যের সমান্তরালে চলে আসে (চিত্রে F বিন্দুতে) তখন আর দেখা যায় না। প্রতিটি মাসের ১/২ দিন এমন অবস্থ বিরাজমান থাবে। এসময় চাঁদ দেখা যায় না। এর অর্থ এই নয় যে চাঁদ আকাশে থাকে না। বরং এর অর্থ হলো সূর্যের কাছাকাছি অবস্থান করার কারনে তার তীব্র আলোর প্রভাবে চাঁদ মানুষের দৃষ্টিগোচর হয় না। এরপর যখনই চাঁদ সূর্যের সমান্তরাল রেখা সামান্য সরে আসে এবং চিত্রে G বিন্দুতে উপস্থিত হয় তখনই ধনুকের মত বাকা এবং সুতোর মতো চিকন নতুন চাঁদ দেখা যায়। চাঁদ যখন চিত্রে G বিন্দুতে উপস্থিত হয়

তখন পৃথিবীর সকল স্থান হতে এটা দেখা যাবে এমন নয়। বরং এ অবস্থায় চাঁদ দেখার জন্য শর্ত হলো যে স্থান হতে চাঁদ দেখা হচ্ছে সেখানে রাত আগমন করা। এবং সেখানে চাঁদ ডুবে না যাওয়া। চিত্রে A বিন্দুতে সামান্য পুর্ব দিকে অবস্থিত স্থান সমুহতে G বিন্দুতে অবস্থিত নতুন চাঁদ দেখা যাবে যেহেতু সেখান এখন সূর্য ডুবে গেছে কিন্তু চাঁদ ডুবে নি। তবে A বিন্দুর বেশি পুর্বে অবস্থিত এলাকাসমুহতে (যেমন B বিন্দুতে) চাঁদ দেখা যাবে না। কারন এখানে সুর্য ও চাঁদ উভয়ই ডুবে গেছে। একইভাবে A বিন্দুর লোকেরা যখন চাঁদ দেখছে সেসময় পশ্চিম দিকে অবস্থিত (যেমন D বিন্দুতে) চাঁদ দেখা সম্ভব নয়। যেহেতু এখানে আকাশে চাঁদ ও সুর্য উভয়ই বিদ্যমান রয়েছে। ফলে সুর্যের আলোর প্রভাবে চাঁদ দৃষ্টির বাইরে থেকে যাবে। এসকল এলাকাতে যখন সন্ধা নামবে তখন চাঁদ দেখা যাবে। সুতারাং পৃথিবী পৃষ্ঠের A বিন্দু সাপেক্ষে চাঁদের

কক্ষপথের বিন্দুই হলো চাঁদের মাতলা' (مطلع) বা উদয়স্থল।

এখন পূর্বে আমরা যা বলেছি তার সারমর্ম হলো, যদি বৈজ্ঞানিক হিসাব-নিকাশের মাধ্যমে নিশ্চিত জানা যায় যে পৃথিবীর কোনো এলাকা সাপেক্ষে চাঁদ তার উদয়স্থলে রয়েছে কিন্তু মেঘ বা অন্য কোনো কারনে কেউ তা স্বচক্ষে অবলোকন করতে সক্ষম না হয় তবে এই হিসাব-নিকাশের উপর নির্ভর করা যাবে না। বরং কেউ স্বচক্ষে দেখেছে এমন স্বাক্ষ্য না পাওয়া পর্যন্ত রোজা বা ঈদ করা যাবে না। হয় চাঁদ দেখতে হবে অথবা ৩০ দিন পূর্ন করতে হবে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে চাঁদের মাতলা' (مطلع) বা অবস্থান বিবেচ্য নয়। অপরদিকে সূর্যের ক্ষেত্রে তার অবস্থানই প্রধান। অর্থাৎ সূর্য কখন ডুববে বা কখন উদয় হবে ইত্যাদি বিষয় স্বচক্ষে অবলোকন করা শর্ত নয়। বরং হিসাব-নিকাশের মাধ্যমে এগুলো সম্পর্কে ধারনা লাভ করতে পারলে

তার উপর নির্ভর করা হবে। কেউ দেখুক বা না দেখুক। একারনে আমরা সলাত ও ইফতারের ব্যপারে চিরস্থায়ী সময় সুচীর অনুসরন করে থাকি। যেটা বৈজ্ঞানীক হিসাব-নিকাশের মাধ্যমে সম্পাদিত। সূর্যের ক্ষেত্রে এধরনের সময়সূচী গ্রহন করার ব্যপারে সকল উলামায়ে কেরাম একমত। কিন্তু চন্দ্রের ক্ষেত্রে তাদের মত হলো, এধরনের বৈজ্ঞানীক হিসাব নিকাশ গ্রহন করা হবে না। যদিও তা সঠিক বলে প্রমানিত হয়। যেহেতু বিষয়টি দেখার সাথে সম্পর্কিত। হিসাব-নিকাশের সাথে নয়।

এখন "চাঁদ দেখে রোজা রাখ চাঁদ দেখে রোজা ছাড়ো" এর অর্থ এই নয় যে, প্রতিটি ব্যক্তিকে চাঁদ দেখতে হবে। বরং সকল উলামায়ে কেরাম একমত যে, কিছু লোক চাঁদ দেখলে তাদের স্বাক্ষ্য অনুযায়ী বাকিরা রোজা রাখবে। ইমাম নাব্বী (র:) বলেন,

وقوله صلي الله عليه وسلم " صوموا للرؤيته " المراد رؤية بعضكم

রসুল (সা:) বলেছেন, "চাঁদ দেখে রোজা রাখ" এখানে উদ্দেশ্য হলো তোমাদের মধ্যে কিছু লোকের চাঁদ দেখার মাধ্যমে রোজা রাখো। [শারহে মুহাযযাব]

এ বিষয়ে দলিল হলো ইবনে আব্বাস থেকে বর্নিত একটি হাদীস। তিনি বলেন,

جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال إني رأيت الهلال قال أتشهد أن لا إله إلا الله ؟ أتشهد أن محمدا رسول الله ؟ قال نعم قال يا بلال ! أذن في الناس أن يصوموا غدا

একজন গ্রাম্য ব্যক্তি রসুলুল্লাহ (সা:) এর নিকট এসে বলল আমি চাঁদ দেখেছি। রসুলুল্লাহ (স:) তাকে বললেন তুমি কি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর স্বাক্ষ্য দাও? সে বলল হ্যাঁ। রসুলুল্লাহ (স:) বললেন, হে বিলাল মানুষের মধ্যে ঘোষনা করো যেনো তারা আগামীকাল রোজা রাখে। [তিরমিযী ও আবু দাউদ]

ইবনে উমার (রা:) বলেন,

تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلاَلَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– أَنِّى رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ.

মানুষ চাঁদ দেখার চেষ্টা করতে লাগলো। আমি রসুলুল্লাহ (স:) এর নিকট এসে বললাম আমি চাঁদ দেখেছি। ফলে তিনি রোজা রাখলেন এবং মানুষের রোজা রাখার আদেশ করলেন। [আবু দাউদ]

অন্য হাদীসে এসেছে রমজান মাস চলাকালীন একদল লোক রসুলুল্লাহ (স:) এর নিকট গমন করে বলল আমরা গতকাল চাঁদ দেখেছি। রসুলুল্লাহ (স:) সেদিন রোজা ভেঙে ফেলার আদেশ দেন। [আবু দাউদ]

প্রথম হাদীসটি বর্ননা করার পর ইমাম তিরমিযী (র:) বলেন,

العمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم قالوا تقبل شهادة رجل واحد في الصيام وبه يقول ابن المبارك و الشافعي و أحمد وأهل الكوفة قال إسحق لا يصام إلا بشهادة رجلين ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين

বেশিরভাগ আলেম এই হাদিসটির উপর আমল করেছেন। তারা বলেছেন রোজা রাখার ব্যাপারে একজন ব্যাক্তির স্বাক্ষ্য গ্রহনযোগ্য হবে। ইবনে মুবারোক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমাদ ও

কুফাবাসীদের এটাই মত। ইসহাক বলেছেন দুজন ব্যাক্তির স্বাক্ষ্য ছাড়া রোজা রাখা যাবে না। তবে রোজা ছাড়ার ব্যাপারে সকল আলেম একমত যে দুজন ব্যক্তির স্বাক্ষ্য ছাড়া তা গ্রহনযোগ্য হবে না। [জামিয়ে তিরমিযী]

মোটকথা কয়জন ব্যক্তির স্বাক্ষ্য গ্রহনযোগ্য হবে এ ব্যাপারে ওলামায়ে কিরামের মাঝে কিছু দ্বিমত থাকলেও স্বাক্ষ্য যে গ্রহনযোগ্য হবে এবং সবার উপর চাঁদ দেখা আবশ্যক নয় এ ব্যাপারে সকল ওলামায়ে কিরার একমত। কিন্তু স্বাক্ষ্য কতদুর পর্যন্ত গ্রহনযোগ্য হবে সে ব্যাপারে দ্বিমত আছে। জমহুর ওলামায়ে কিরামের মত হলো, পৃথিবীর একপ্রান্তের লোকের যদি চাঁদ দেখতে পায় এবং বিশ্বস্থ সূত্রে তা অন্য প্রান্তে পৌছায় তবে সকলের উপর রোজা রাখা ফরজ হবে। এখানে উভয় এলাকার দুরত্ব বা চাঁদের উদয়স্থলের পার্থক্য বিবেচ্য বিষয় নয়। হানাফী, মালেকী ও হাম্বলী মাযহাবের রায় এটাই। ফাতওয়ায়ে আলমগীরীতে বলা হয়েছে,

لَوْ رَأَى أَهْلُ مَغْرِبٍ هِلَالَ رَمَضَانَ يَجِبُ الصَّوْمُ عَلَى أَهْلِ مَشْرِقٍ

যদি পশ্চিমের লোকেরা চাঁদ দেখে তবে পুর্বের লোকদের উপর রোজা রাখা ফরয হবে।

বেহেস্তী জেওরের ১১ নং খন্ডের ১৩৯ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে,

এক শহরের লোক চাঁদ দেখলে অপর শহরের লোকদের জন্য সেটা গ্রহনযোগ্য হবে। উভয় শহর যত দুরেই অবস্থিত হোক।

অপর দিকে শাফেঈ মাযহাবের একদল ওলামায়ে কিরামের মতে যেখানে চাঁদ দেখা যাবে তার আশেপাশের এলাকার জন্য কেবল উক্ত খবর শুনে রোজা রাখা ফরয হবে। দুরবর্তী এলাকার জন্য এটা প্রযোজ্য হবে না। এ বিষয়ে তাদের দলীল হলো সহীহ মুসলিমে বর্নিত ইবনে আব্বাস (রা:) এর ঘটনা যেখানে উল্লেখ আছে মুয়াবীয়া (রা:) এর খেলাফতের সময় একবার সিরীয়াবাসীরা মদিনাবাসীদের এক দিন পূর্বে চাঁদ দেখে ইবনে আব্বাসের নিকট এই খবর পৌছানো হলে তিনি সিরীয়ার লোকদের চাঁদ দেখা গ্রহন করেন নি। তিনি বলেন,

لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلاَ نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلاَثِينَ أَوْ نَرَاهُ

আমরা চাঁদ দেখেছি শনিবার রাতে। অতএব আমরা রোজা রাখতেই থাকবো। যতক্ষন না ত্রিশ দিন পূর্ন হয় বা আমরা চাঁদ দেখি।

তাকে বলা হলো আপনি কি মুয়াবিয়া (রা:) এর চাঁদ দেখা গ্রহন করবেন না? তিনি বললেন না। রসুল (সা:) আমাদের এমনটিই আদেশ করেছেন। [সহীহ মুসলিম]

এমতের স্বপক্ষে এটি একটি শক্ত দলীল। এবিষয়ে আরেকটি দলীল হলো, কোনো কোনো আলেম খুব দুরে অবস্থিত দুটি শহরের ক্ষেত্রে এক এলাকাবাসীর চাঁদ দেখা অন্য এলাকাবাসীর জন্য গ্রহনযোগ্য না হওয়ার ব্যাপারে আলেমদের ইজমা উল্লেখ করেছেন। ইবনে রুশদ্ বলেন,

وأجمعوا أنه لا يراعى ذلك في البلدان النائية كالاندلس، والحجاز

এবিষয়ে সকলে ইজমা করেছেন যে, খুব দূরবর্তী এলাকার জন্য এক এলাকার চাঁদ দেখা অন্য এলাকার জন্য প্রযোজ্য হবে না। যেমন, স্পেন ও হিজাজ। [বিদায়াতুল মুজতাহিদ]

ইবনে তাইমিয়াহ্ (র:) বলেন,

فَإِنَّهُ قَدْ حَكَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ الِاخْتِلَافَ فِيمَا يُمْكِنُ اتِّفَاقُ الْمَطَالِعِ فِيهِ فَأَمَّا مَا كَانَ مِثْلَ الْأَنْدَلُسِ وَخُرَاسَانَ فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَر

ইবনে আব্দিল বার এ বিষয়ে ইজমা উল্লেখ করেছেন যে, এক এলাকার চাঁদ দেখা অন্য এলাকার জন্য গ্রহনযোগ্য কিনা এই বিষয়ে ইখতিলাফ কেবল এমন দুটি এলাকার জন্য প্রযোজ্য যাদের (মধ্যবর্তী দুরত্ব কম হওয়ার কারনে) উদয়স্থল একই হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে কিন্তু যদি স্পেন ও খুরাসানের মত দুরত্ব হয় তবে সে ক্ষেত্রে এক এলাকার চাঁদ দেখা অন্য এলাকার জন্য গ্রহনযোগ্য না হওয়ার ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই।

[মাজমুয়ায়ে ফাতাওয়া]

এবিষয়ে ইবনে আব্দিল বার যে ইজমা উল্লেখ করেছেন তা প্রমানীত হলে ভিন্নমত অবলম্বনের কোনো সুযোগ থাকে না। কিন্তু বহু সংখ্যক আলেম এখানে ভিন্নমত উল্লেখ করেছেন। ইমাম নাব্বী (র:) বলেন,

وقال بعض أصحابنا تعم الرؤية في موضع جميع أهل الأرض

আমদের মাযহাবের কোনো কোনো আলেম বলেছেন, কোনো এক স্থানে চাঁদে দেখা গেলে তা সমগ্র পৃথিবীবাসীর জন্য প্রযোজ্য হবে। [শারহে মুসলিম]

ইবনে হাযার আসক্বালানী (র:) শাফেয়ী মাযাহাবের এই মতটি উল্লেখের পর বলেন,

وهو المشهور عند المالكية لكن حكى بن عبد البر الإجماع على خلافه

মালেকী মাযহাবের প্রশিদ্ধ মত এটাই। কিন্তু ইবনে আব্দিল বার এর বিপরীতে ইজমা উল্লেখ করেছেন। [ফাতহুল বারী]

দেখা যাচ্ছে ইবনে আব্দিল বার যে ইজমা উল্লেখ করেছেন বহু সংখ্যক আলেম হতে তার বিপরীত মত বর্নিত আছে। ফলে এটাকে ইজমা হিসেবে গ্রহন করা যায় না। এ বিষয়ে ইমাম শাওকানী বলেন,

لأن الإجماع لا يتم والمخالف مثل هؤلاء الجماعة

এত বিপুল সংখ্যক উলামায়ে কেরামের দ্বিমত থাকা সত্বেও এ বিষয়ে ইজমা প্রমানীত হতে পারে না।

[নাইলুল আওতার]

এখন ইজমা প্রমানীত না হলে বিষয়টি ইখতিলাফী মাসয়ালা হিসেবেই গন্য হবে। সেক্ষেত্রে উভয় মতের উপর চিন্তা গবেষনা করে কোনটি বেশি সঠিক তা নিয়ে আলোচনা-সমালোচনার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

প্রথমেই আমরা উপরের আলোচনাতে উল্লেখিত প্রমানীত তত্ত্বগুলো সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করবো। যাতে পাঠক সেগুলো সহজে স্মরন রাখতে পারেন। যেহেতু পরবর্তী আলোচনাতে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহনে সেগুলো কার্যকরী ভূমিকা রাখবে। ইনশাআল্লাহ।

প্রথমত আমরা দেখেছি, চাঁদ দেখে রোজা রাখতে হবে এবং চাঁদ দেখে রোজা ছাড়তে হবে। মেঘে ঢেকে গেলে ত্রিশ দিন পূর্ন করতে হবে। এ বিষয়ে কোনোরূপ বৈজ্ঞানিক হিসাব-নিকাশের উপর নির্ভর করা যাবে না। যদি হিসাব-নিকাশের মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে জানা যায় চাঁদ দেখা যাওয়ার মতে অবস্থানে আছে কিন্তু কেউ স্বচক্ষে দেখেছে বলে প্রমানীত না হয় তবে উক্ত

হিসাবের মাধ্যমে কিছুই প্রমানীত হবে না। কেননা রসুলুল্লাহ (স:) বলেন, "আমরা নিরক্ষর জাতি। আমরা লিখিনা হিসাবও করি না।" সুতারাং এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম চাঁদের মাতলা (مطلع) বা অবস্থানকে ধার্তব্য করেন নি। সুতারাং চাঁদের বিধান দেখার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু এর অর্থ এই নই যে, সকল মুসলিমকে চাঁদ দেখতে হবে। বরং কিছুলোক চাঁদ দেখলে তাদের স্বাক্ষ্য অন্যরা গ্রহন করবে। এ ব্যাপারে সকলে একমত।

এতদুর পর্যন্ত সকলেই একমত। এ হিসাবে একদল মুসলিম চাঁদ দেখলে অন্যরা তাদের স্বাক্ষ্য অনুযায়ী আমল করবে তাদের এলাকা যত দুরেই অবস্থিত হোক। এটাই স্বাভাবিক। যতক্ষন না এর বিপরীতে ভিন্ন কোনো দলিল পাওয়া যায়। যেখানে নির্দিষ্ট কোনো দুরত্ব বা নির্দিষ্ট কোনো অবস্থায় একের স্বাক্ষ্য অন্যের জন্য গ্রহনযোগ্য নয় বলে প্রমানীত হয়। সুতারাং যারা পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে চাঁদ দেখা গেলে সে খবর শুনে অন্য প্রান্তের লোকেরা রোজা রাখবে এবং ঈদ

পালন করবে এমন মতবাদে বিশ্বাসী তারাই "স্বাক্ষ্য গ্রহনের মাধ্যমে রোজা রাখা ও ঈদ পালন করা" নীতির আলোকে স্বাভাবিক অবস্থানে রয়েছেন। এখন যারা এই স্বাভাবিক বিধিবিধানকে দুরত্ব, স্থান ইত্যাদির আলোকে সীমাবদ্ধ করতে চান তাদের ভিন্ন কোনো দলিল পেশ করতে হবে। তা করতে স্বক্ষম না হলে বা তাদের পেশকৃত দলীল অগহনযোগ্য হলে স্বাক্ষ্য গহনের সাধারন বিধানের ভিত্তিতে স্বাভাবিক বিধানটিই গ্রহনযোগ্য হবে। সুতারাং আমাদের দেখতে হবে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের লোকদের জন্য পৃথকভাবে চাঁদ দেখার পক্ষে তারা মূলত কি দলীল পেশ করেছেন যাতে আমরা বুঝতে পারি সেগুলো কতদূর গ্রহনযোগ্য।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, পৃথক পৃথকভাবে রোজা ও ঈদ পালন করার ব্যাপারে মূলত দুটি দলীল পেশ করা যায়। প্রথমত: ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্নিত হাদীসটি। দ্বিতীয়ত: ইবনে আব্দিল বার কর্তৃক উল্লেখিত ইজমা। পুর্বে আমরা দেখেছি যে, ইবনে আব্দিল বার দুরবর্তী এলাকার ক্ষেত্রে এক এলাকার লোকদের চাঁদ দেখা অন্য এলাকায় প্রযোজ্য না হওয়ার ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের যে ইজমা উল্লেখ করেছেন

তা সন্দেহাতীতভাবে প্রমানীত নয়। যেহেতু এর বিপরীতে বহুসংখ্যক আলেমের মত রয়েছে। আর যে বিষয়ে ইখতিলাফ থাকে সেটা ইজমা হতে পারে না। এখন বাকি থাকে ইবনে আব্বাস থেকে বর্নিত হাদীসটি। সেখানে তিনি সিরিয়াবাসীর চাঁদ দেখা গ্রহন করেননি। যারা সারা পৃথিবীতে একই সাথে রোজা ও ঈদ পালনের পক্ষে তারা অনেক রকম ভাবে হাদিসটির ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেছেন। ইমাম নাব্বী সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যায় প্রতিটি দেশের জন্য পৃথক চাঁদ দেখা অধ্যায়ে ইবনে আব্বাসের হাদীসটি প্রসঙ্গে বলেন,

وهو ظاهر الدلالة للترجمة

এই হাদিসটি স্পষ্টভাবে এ বিষয়ে দলীল।

এর পর তিনি এর স্বপক্ষে শাফেয়ী মাযহাবের একদল ওলামায়ে কিরামের মত উল্লেখের পর বলেন,

وقال بعض أصحابنا تعم الرؤية في موضع جميع أهل الأرض فعلى هذا نقول انما لم يعمل بن عباس بخبر كريب لأنه شهادة فلا تثبت بواحد لكن ظاهر حديثه أنه لم يرده لهذا وانما رده لأن الرؤية لم يثبت حكمها في حق البعيد

তবে আমাদের মাযহাবের কেউ কেউ বলেছেন, এক এলাকাতে চাঁদ দেখলে সমস্ত পৃথিবীর জন্য তা প্রযোজ্য হবে। এই মতের পক্ষে আমরা এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলতে পারি ইবনে আব্বাস (রা) চাঁদ দেখার খবর গ্রহন করেননি কারন এখানে একজন ব্যাক্তি স্বাক্ষ্য দিচ্ছে [অর্থাৎ হয়তো তিনি এ বিষয়ে দুজনের স্বাক্ষ্য ছাড়া গ্রহন করতেন না।] কিন্তু হাদীসটির প্রকাশ্য অর্থে বোঝা যায় তিনি এ কারনে এ খবর পরিত্যাগ করেননি। বরং তিনি এটা পরিত্যাগ করছেন কারন তিনি মনে করেছেন দুরের খবর গ্রহনযোগ্য নয়। [শারহে মুসলিম]

অনেকে বলেছেন, সম্ভবত তিনি সিরিয়াবাসীর চাঁদ দেখা গ্রহন করেননি কারন খবরটি মদিনাতে রমজান শুরু হওয়ার পর এসেছে। ইমাম ইবনে তাইমিয়া এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বলেছেন, যদি চাঁদ দেখার খবর এত দুর থেকে আসে যেখান থেকে খবর পৌঁছাতে কয়েক দিন লেগে যায় এবং খবর পৌঁছানোর পূর্বেই অন্য অন্য এলাকার লোকের নিজেরা চাঁদ দেখে রোজা শুরু করে দেয় তবে পরবর্তীতে খবর পৌঁছালে সেটার উপর আমল করা যাবে না এবং উক্ত দিনের রোজা

কাজা করারও দরকার নেই। তিনি এ বিষয়ে দলীল হিসেবে ইবনে আব্বাস (রা:) এর হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। [মাজমুয়ায়ে ফাতাওয়া] কিন্তু এ বিষয়ে ইমাম ইবনে তাইমিয়া ছাড়া অন্যান্য ওলামায়ে কেরামের রায় হলো যদি আমরা এমন বলি পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তের চাঁদ দেখা গ্রহন করতে হবে তাহলে নিজের চাঁদ দেখে রোজা শুরু করার পরও যদি খবর আসে এক দিন পূর্বে অন্য কোথাও চাঁদ দেখা গেছে তবে সেটা ধার্তব্য হবে এবং সেই হিসেবে প্রথম দিনের রোজা কাজা করে নিতে হবে। [শারহুল মুহাযযাব] এই মাছয়ালাতে এটিই ওলামায়ে কেরামের সঠিক মত এই মতটিই কিয়াসের সাথে সঙ্গতিপূর্ন। যেহেতু হাদিসে চাঁদ দেখার খবর পৌঁছালে তা গ্রহন করার নির্দেশনা পাওয়া যায়। সেটা যখনই পোঁছাক। একারনে রোজা শুরু করে দেওয়ার পর দিনের শেষ ভাগে খবর পোঁছালেও রসুলুল্লাহ (স:) তার আলোকে রোজা ভেঙে ফেলতে এবং আগামী দিন ঈদের সলাত আদায় করতে আদেশ করেছেন। সুতারাং ইবনে আব্বাস (রা:) এর হাদীসটির এই ব্যাখ্যাও সঠিক নয়।

মোটকথা, ইনসাফ করলে এ কথা স্বীকার করতে হয় যে, ইবনে আব্বাস (রা:) দুর দেশের চাঁদে দেখার খবর গ্রহন করা যাবে না এমনটাই মনে করেছেন। অন্তত হাদীসটির প্রকাশ্য অর্থ থেকে এমনটিই বোঝা যায়।

হাদীসটার শেষে তিনি বলেছেন, রসুলুল্লাহ (স:) আমাদের এমনটি করতে বলেছেন। অনেকে মনে করতে পারেন এই হাদীসটির মাধ্যমে প্রমানীত হয় যে, রসুলুল্লাহ (স:) নিজে বলেছেন এক এলাকার চাঁদ অন্য এলাকার জন্য গ্রহনযোগ্য নয়। কিন্তু প্রকাশ্যে অর্থে যা বোঝা যায় ইবনে আব্বাস (রা:) এই কথার মাধ্যমে রসুলুল্লাহ (স:) এর ঐ কথার দিকে ইঙ্গিত করেছেন যেখানে তিনি বলেন, "চাঁদ দেখে রোজা রাখ চাঁদ দেখে রোজা ছাড়ো।" অর্থাৎ এই হাদীসটির উপর চিন্তা গবেষণা করে ইবনে আব্বাস (রা) এর নিকট এমনটিই মনে হয়েছে যে, প্রতিটি এলাকার জন্য পৃথক পৃথক চাঁদ দেখতে হবে। সুতারাং এ বিষয়ে সঠিক কথা হলো বিষয়টি ইবনে আব্বাস (রা) এর নিজস্ব ইজতিহাদ। তবে ইবনে আব্বাসের মত একজন বিজ্ঞ সাহাবীর মত মোটেও অবহেলা করার মত নয়। বিশেষ করে যখন তার মতের বিপরীতে অন্য কোনো সাহাবার মত পাওয়া

যায় না। কিন্তু বিভিন্ন কারনে এই মতটি গ্রহন করা সম্ভব নয়।

প্রথমত এই মতের আলোকে আমরা যদি বলি দুর এলাকার চাঁদ দেখা গ্রহনযোগ্য নয় তবে প্রশ্ন এসে যায় কতদূর? কিন্তু এই প্রশ্নের কোনো সদুত্তর যেমন এই হাদীসটির মধ্যে নেই একইভাবে এই হাদীসটি গ্রহন করে যারা দূরবর্তী এলাকার জন্য পৃথক চাঁদ দেখার পক্ষে রায় দিয়েছেন তারাও এটার সঠিক সমাধান দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। এ বিষয়ে তারা বিভিন্ন মতামত উল্লেখ করেছেন। যেমন,

ক) এক অঞ্চলের জন্য তাদের চাঁদ দেখা গ্রহনযোগ্য হবে অন্য অঞ্চলে নয়।

খ) যে এলাকাতে চাঁদ দেখা গেছে সেখান থেকে কসরের দুরত্ব পর্যন্ত তা গ্রহনযোগ্য হবে।

গ) যেসব এলাকার উদয়স্থল একই সেখানে এক স্থানে চাঁদ দেখা অন্য স্থানের জন্য গ্রহনযোগ্য হবে কন্তু উদয়স্থল ভিন্ন হলে গ্রহনযোগ্য হবে না।

এই সকল সীমারেখার প্রতিটির ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের তীব্র আপত্তি রয়েছে। প্রথমদুটি মত সম্পর্কে ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন,

وَكِلَاهُمَا ضَعِيفٌ ؛ فَإِنَّ مَسَافَةَ الْقَصْرِ لَا تَعَلُّقَ لَهَا بِالْهِلَالِ . وَأَمَّا الْأَقَالِيمُ فَمَا حَدَّدَ ذَلِكَ

এই দুটি মতই দূর্বল। কেননা চাঁদের সাথে কসরের দূরত্বের কোনো সম্পর্ক নেই। আর একটি অঞ্চলের সাথে আরেকটি অঞ্চলের সীমারেখা কে ঠিক করবে? [মাজমুয়ায়ে ফাতাওয়া]

অঞ্চলগত পার্থক্যের ব্যাপারে ইবনে তাইমিয়ার আপত্তি খুবই সঙ্গত। মূলত অঞ্চলের সীমারেখা মানুষের হাতে গড়া এবং সদা পরিবর্তনশীল। কিভাবে আল্লাহর বিধান মানুষের হাতে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে! আজ বাংলাদেশ একটি দেশ হিসেবে গন্য হচ্ছে বিধায় এখানে একত্রে রোজা-ঈদ পালন করা হচ্ছে। আগামীতে যদি এটা ভেঙে কয়েকটি দেশে পরিনত হয় তবে সেসব অঞ্চলে পৃথক পৃথকভাবে রোজা-ঈদ পালন করা হবে? এটা মেনে নেওয়া কষ্টকরই বটে। সুতরাং

এ বিষয়ে প্রশ্ন এটাই যে, কে এই সীমানা ঠিক করে দিল? কীভাবে এটা ঠিক করা হলো?

পরবর্তীতে তিনি এ দুটি বিষয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন,

إِذَا اعْتَبَرْنَا حَدًّا : كَمَسَافَةِ الْقَصْرِ أَوْ الْأَقَالِيمَ فَكَانَ رَجُلٌ فِي آخِرِ الْمَسَافَةِ وَالْإِقْلِيمِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ وَيُفْطِرَ وَيَنْسُكَ وَآخَرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ غَلْوَةُ سَهْمٍ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَهَذَا لَيْسَ مِنْ دِينِ الْمُسْلِمِينَ

যদি আমরা কসরের দূরত্ব বা অঞ্চলগত সীমারেখাকে মাপকাঠি হিসেবে গন্য করি তবে একজন ব্যাক্তি যদি উক্ত দূরত্ব বা অঞ্চলের সীমানার ঠিক শেষ প্রান্তে অবস্থান করে তবে সে রোজা রাখবে কোরবানী করবে। কিন্তু ঐ সীমানা হতে একটি ধনুক পরিমান (অতি সামান্য) দূরে অবস্থিত অন্য এক ব্যাক্তি এসবের কিছুই করবে না এটা আল্লাহর দ্বীন হতে পারে না। [মাযমুয়ায়ে ফাতাওয়া]

তাছাড়া আবুদাউদ বর্নিত একটি সহীহ হাদিসে এসেছে, একদল মুসাফির রসুলুল্লাহ (স:) নিকট এসে গতকাল চাঁদ দেখার খবর দিলে তিনি তা গ্রহন করেন।

[আবুদাউদ] তারা কতদূর থেকে এসেছে এ বিষয়ে কোনো প্রশ্ন করেছেন বলে হাদীসে বর্নিত নেই। এ থেকে একই সাথে দুটি বিষয় প্রমানীত হয়। এক অঞ্চলের চাঁদ অন্য অঞ্চলে গ্রহনযোগ্য হবে এবং দুটি অঞ্চলের মধ্যে দুরত্ব ধার্তব্যের বিষয় নয়।

অঞ্চলগত সীমারেখা ও কসরের দূরত্বের ব্যাপারটির দূর্বলতা অনুভব করে ইমাম নাব্বী উপরোক্ত মতামতসমূহের মধ্যে উদয়স্থলের ভিন্নতা লক্ষ্য করাটাই সঠিক বলেছেন। কিন্তু ইমামুল হারামাইন, ইমাম বাগাবী ইত্যাদি আলেম এর উপর আপত্তি তুলে বলেছেন,

لان اعتبار المطالع يحوج الي حساب وتحكيم المنجمين وقواعد الشرع تأبى ذلك فوجب اعتبار مسافة القصر

উদয়স্থলের পার্থক্য লক্ষ্য করতে হলে হিসাব-নিকাশের আশ্রয় নিতে হয় এবং জোতির্বীদদের কথার উপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু শরিয়তের মূলনীতিতে এটা গ্রাহ্য নয়। অতএব এবিষয়ে কসরের দূরত্বকে মাপকাঠি হিসেবে গ্রহন করতে হবে। [শারহে মুহাযযাব]

দেখা যাচ্ছে যারা ভিন্ন ভিন্ন এলাকার জন্য পৃথকভাবে চাঁদ দেখার পক্ষে তারা দূরত্বের কোনো সীমারেখা আমাদের সামনে উপস্থিত করতে পারছেন না। তারা যেসব সীমারেখা উল্লেখ করেছেন সে বিষয়ে তারা একমত নয়। সেগুলো নির্দিষ্ট নয় এবং চাঁদ দেখার সাথে সেগুলোর সম্পর্ক প্রমানীত নয়। সর্বোপরি সেগুলো দলিল প্রমানের মাধ্যমে প্রমানীত নয়।

অর্থাৎ যে কারনে চাঁদ দেখার ব্যাপারে দুরত্বের পার্থক্য বিবেচ্য নয় সেটি হলো, আমরা পূর্বেই প্রমান করেছি যে, ইবনে আব্বাস (রা:) হতে বর্নিত রেওয়ায়েতটি তার নিজস্ব ইজতিহাদ। একজন সাহবীর ইজতিহাদ অবশ্যই গ্রহনযোগ্য। বিশেষত যদি তার বিপরীতে অন্য কোনো সাহাবীর মত না পাওয়া যায়। কিন্তু কোনো সাহাবীর মত যদি রসুলুল্লাহ (স:) হতে বর্নিত হাদীসের বিরুদ্ধে যায় তবে তা পরিত্যাগ করাই সঙ্গত। এক্ষেত্রে আমরা পূর্বে যা উল্লেখ করেছি তাতে প্রমানীত হয়েছে যে, দূরত্বের পার্থেক্যে ব্যাপারে ওলামায়ে কিরাম যা কিছু উল্লেখ করেছেন তার বেশিরভাগই মূল বিষয়ের সাথে অসংলগ্ন। শুধুমাত্র চাঁদের উদয়স্থলের পার্থক্যের বিষয়টি ছাড়া। মুহক্কিক উলামায়ে কিরাম এটিকেই দূরত্বের

মাপকাঠি হিসেবে গহন করেছেন এবং এই মতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু এই মতটির উপর অন্যান্য উলামায়ে কিরাম যে আপত্তি করেছেন তা খুবই সঙ্গত। আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, ইমামুল হারামাইন ও অন্যান্য ওলামায়ে দ্বীন এই মতের উপর আপত্তি করে বলেন,

لان اعتبار المطالع يحوج الي حساب وتحكيم المنجمين وقواعد الشرع تأبى ذلك فوجب اعتبار مسافة القصر

উদয়স্থলের পার্থক্য লক্ষ্য করতে হলে হিসাব-নিকাশের আশ্রয় নিতে হয় এবং জোতির্বীদদের কথার উপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু শরিয়তের মূলনীতিতে এটা গ্রাহ্য নয়। [শারহুল মুহাজ্জাব]

পূর্বে আমরা দেখেছি চাঁদ দেখা প্রসঙ্গে জোতির্বিদ্যার হিসাব-নিকাশের উপর নির্ভর না করার ব্যাপারে অল্প কিছু ব্যাতিক্রম ছাড়া সকল উলামায়ে কিরাম একমত। তারা এ বিষয়ে রসুলুল্লাহ (স:) এর একটি কথাকে দলীল হিসাবে ব্যাবহার করেছেন। এ প্রসঙ্গে রসুলুল্লাহ (স:) বলেন,

إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا هكذا) . يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين

আমরা উম্মী জাতি। আমরা লিখিনা, হিসাবও রাখিনা। তাছাড়া মাস বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে । অর্থাৎ মাস ঊনত্রিশ দিনেরও হয় ত্রিশ দিনেও হয়। [সহীহ বুখারী]

কিন্তু ইবনে আব্বাস (রা:) এর মতটি গ্রহন করলে শেষ পর্যন্ত জোতির্বিদদের হিসাব-নিকাশের উপর নির্ভর করতে হয়। যা রসুলুল্লাহ (স:) এর নির্দেশনার বিরুদ্ধে। সুতারাং এ বিষয়ে কোনোরুপ দূরত্বের পার্থক্য ছাড়ায় পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে চাঁদ দেখার খবর বিশ্বস্থ সুত্রে অন্য প্রান্তে পৌঁছালে সমগ্র পৃথিবীবাসীর উপর রোজা রাখা ও ঈদ পালন করা ফরয হবে। এটিই সঠিক মত। আর আল্লাহই ভালো জানেন।

এ বিষয়ে সঠিক মতটি অবগত হওয়ার পর আমরা নিম্মোক্ত তিনটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখবো।

[১] উপরোক্ত আলোচনার আলোকে পাঠক নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন যে, বিভিন্ন অঞ্চলে পৃথক ভাবে রোযা ও ঈদপালন করা বা সমগ্র পৃথিবীবাসী একএে রোযা ও

ঈদ পালন করা উভয়পক্ষে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ওলামায়ে কিরামের মত রয়েছে। উভয় দলের পক্ষে দলীল প্রমান ও যুক্তি রয়েছে। সুতরাং একদলের উচিৎ নয় অন্য দলকে বিরক্ত করা বা তাদের ভ্রান্ত মনে করা। এমন বলাও সঙ্গত নয় যে তারা ঈদের দিন রোজা রাখছে ফলে হারাম কাজে লিপ্ত হয়েছে। কারন যে ব্যাক্তি উক্ত দিন রোজা রাখছে সে তো ওটা ঈদের দিন মনে করছে না এবং মনে না করার ব্যাপারে তার ওযর রয়েছে যেহেতু এটা ইখতিলাফী মাসয়ালা। এখানে বিভিন্ন রকম মত রয়েছে। আর যে বিষয়ে ইখতিলাফ হয় সেসব বিষয়ে কড়াকড়ি করা সঙ্গত নয়। একই ভাবে যারা একদিন পূর্বে রোজা রাখা শুরু করেছে এবং একদিন আগে ঈদ করেছে এমন বলা যাবে না যে, তারা একটি ফরজ রোজা পরিত্যাগ করেছে। যেহেতু প্রত্যেকে নিজ নিজ মত অনুসারে আমল করেছে। এবং প্রত্যেকের মতের পক্ষেই বিপুল সংখ্যক ওলামায়ে কিরামের মত রয়েছে। এক পক্ষের উচিৎ নয় অন্য পক্ষকে নিজের মত মেনে নিতে বাধ্য করা। ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রঃ) বলেন,

لَيْسَ لِلْفَقِيهِ أَنْ يَحْمِلَ النَّاسَ عَلَى مَذْهَبِهِ . وَلِهَذَا قَالَ الْعُلَمَاءُ الْمُصَنِّفُونَ فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ : إنَّ مِثْلَ هَذِهِ الْمَسَائِلِ الِاجْتِهَادِيَّةِ لَا تُنْكَرُ بِالْيَدِ وَلَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يُلْزِمَ النَّاسَ بِاتِّبَاعِهِ فِيهَا ؛ وَلَكِنْ يَتَكَلَّمُ فِيهَا بِالْحُجَجِ الْعِلْمِيَّةِ فَمَنْ تَبَيَّنَ لَهُ صِحَّةُ أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ تَبِعَهُ وَمَنْ قَلَّدَ أَهْلَ الْقَوْلِ الْآخَرِ فَلَا إنْكَارَ عَلَيْهِ

একজন আলেমের উচিত নয় অন্যকে নিজের মত মানতে বাধ্য করা। একারনে শাফেয়ী মাযহাবের ও অন্যান্য মাযহাবের যেসব উলামায়ে কিরাম সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ সম্পর্কে লেখালেখি করেছেন তারা বলেছেন ইজতিহাদী বিষয়সমূহতে হাত দ্বারা নিষেধ করা যাবে না। মানুষকে এগুলো মানতে বাধ্যও করা যাবে না। বরং যুক্তি প্রমানের মাধ্যমে তাদের বোঝাতে হবে। যদি কারও নিকট এটা পছন্দ হয় সে এটা মেনে নেবে আর যদি কেই অন্য মতটি মানে তবে তাকে কোনোভাবে তিরষ্কার করা যাবে না। [মাযমুয়ায়ে ফাতাওয়া]

ইমাম নাব্বী, ইবনে হাজার আসকালানী ইত্যাদি ওলামায়ে কিরাম এসব ব্যাপারে অনুরূপ কথা বলেছেন।

অনেকে বলেন রসুলুল্লাহ (স:) বলেছেন, বেজোড় রাত সমুহতে শবে ক্বদর তালাশ করো। যদি ভিন্ন ভিন্ন দিন রোজা ও ঈদ পালন করা হয় তবে একজনের জন্য যেদিন বেজোড় অন্য জনের জন্য একই দিন জোড় বলে গন্য হবে। তাহলে শবে ক্বদর কোন রাতে হবে? আসলে এসকল প্রশ্ন সঠিক নয়। কারন সময় আল্লাহর সৃষ্টি। তিনি এগুলো নিয়ন্ত্রন করেন। আমরা দুনিয়ার জ্ঞানে যা বুঝি সেটার মাধ্যমে আল্লাহর সিদ্ধান্তকে ব্যাখ্যা করা যাবে না। যেমন হাদিসে এসেছে আল্লাহ (সুবঃ) প্রতিরাতের শেষ অংশে প্রথম আসমানে নেমে আসেন। কিন্তু প্রকৃত সত্য হলো সবসময় পৃথিবীর কোনো না কোনো স্থানে রাতের শেষ অবস্থা বিদ্যমান থাকে। তাহলে কি এমন বলা যায় যে, আল্লাহ (সুবঃ) সবসময় প্রথম আসমানে থাকেন? আসলে এই সকল বিষয়ে এভাবে চিন্তা করার সুযোগ নেই। এই সব প্রশ্ন উপস্থাপন করে মূল বিষয়টি অস্বিকার করাও সঠিক নয়। সুতারাং শবে ক্বদরের প্রসঙ্গ টেনে উপোরোক্ত

বিষয়ে কোনো সমাধান পাওয়া সম্ভব নয়। সে চেষ্টা করাও উচিৎ নয়। বরং দলিল প্রমানের আলোকে কোনটা সঠিক সেটা লক্ষ্য করতে হবে এবং বিভিন্ন মতালম্বীকে সুযোগ দিতে হবে। এটাই সঠিক পদ্ধতি। অনেকে মুসলিমদের ঐক্যের স্লোগান তুলে একই দিনে রোজা ও ঈদ পালনের ব্যাপারে অত্যাধিক কড়াকড়ি করে থাকেন। কোনো সন্দেহ নেই যে, তাদের কড়াকড়াতে ঐক্যের পরিবর্তে ফাটলই সৃষ্টি হয়। কারন যেসব বিষয়ে পূর্বে থেকেই দ্বীমত রয়েছে সেগুলোর মেনে নেওয়ার মাধ্যমেই ঐক্য সম্ভব। সেসব ব্যাপারে একদলকে নিজের মত মানতে বাধ্য করার মাধ্যমে নয়। বরং এই ধরনের বাড়াবাড়াতে কেবল ঘৃনাই ছাড়াবে। এটা অকারনে হানাহানী-হৈ হট্টগোলের কারন হবে যা ইসলামে সম্পুর্ন নিষিদ্ধ।

[২] উপরে আমরা উল্লেখ করেছি যে, সমগ্র পৃথিবীতে একত্রে রোজা ও ঈদ পালন করার মতটিই অধিক সঠিক। এখন এ বিষয়ে একটি মাসয়ালার উত্তর দেওয়া খবই জরুরী। সেটা হলো, বর্তমান সময়ে অত্যাধুনীক প্রযুক্তির মাধ্যমে পৃথিবীর কোথাও চাঁদ দেখা গেলে মুহুর্তের মধ্যে সমস্থ পৃথিবীতে সে খবর পৌঁছে দেওয়া

সম্ভব। এখন যে স্থানে যে সময় চাঁদ দেখা যাচ্ছে উক্ত সময়ে পৃথিবীর কোথাও সকাল, কোথাও জোহর, কোথাও আসর, কোথাও সন্ধা বা ভোর। তাহলে ভিন্ন ভিন্ন সময় ও স্থানের লোকেরা চাঁদ দেখার খবর শুনে কে কখন রোজা রাখা শুরু করবে?

এর উত্তরে আমরা অন্য একটি মাসয়ালা উল্লেখ করবো যে বিষয়ে পূর্ববর্তী ওলামায়ে কিরামের মতামত রয়েছে এবং সেই আলোকে এই মাসয়ালাটির সমাধান করার চেষ্টা করবো ইনশা-আল্লাহ। ইমাম নাব্বী (র:) বলেন,

إذا رأوا الهلال بالنهار فهو لليلة المستقبلة سواء رأوه قبل الزوال أو بعده * هذا مذهبنا لا خلاف فيه وبه قال أبو حنيفة ومالك ومحمد وقال الثوري وابن أبى ليلى وأبو يوسف وعبد الملك بن حبيب المالكى: ان رأوه قبل الزوال فلليلة الماضية أو بعده فللمستقبلة

যদি দিনের বেলা চাঁদ দেখা যায় তবে সেটা আগামী দিনের চাঁদ বলে গন্য হবে সেটা জোহরের সময়ের পরে হোক বা আগে হোক এটা আমাদের মাযহাব। এ বিষয়ে আমাদের মাযহাবে কোনো দ্বিমত নেই। ইমাম আবু হানীফা, মালেক ও মুহাম্মদ এই মত দিয়েছেন।

আছ-ছাওরী, ইবনে আবি লাইলা, আবু ইউসুফ, মালেকী মাযহাবের আব্দুল মালিক ইবনে হাবীব বলেছেন, জোহরের সময় হওয়ার পর চাঁদ দেখলে তা আগামী দিনের বলে গন্য হবে কিন্তু তার পুর্বে দেখলে গতদিনের বলে গন্য হবে। [শারহুল মুহাজ্জাব]

সুতরাং দিনের বেলা চাঁদ দেখা গেলে ওলামায়ে কিরামের দুটি মত রয়েছে। একটি মতে জোহরের সময়ের পূর্বে হলে গত দিনের এবং পরে হলে আগামী দিনের বলে গন্য হবে। আর দ্বিতীয় মতে সর্বাবস্থায় আগামী দিনের বলে গন্য হবে।

দ্বিতীয় দলৈ পক্ষে দলীল হলো বায়হাক্বীতে বর্নিত একটি ঘটনা যেখানে বলা হয়েছে,

ان ناسا رأوا هلال الفطر نهارا فأتم عبد الله بن عمر رضى الله عنهما صيامه الي الليل وقال لا حتى يرى من حيث يروه بالليل

একদল লোক দিনের বেলা চাঁদ দেখলে আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা:) তার রোজা পূর্ন করলেন এবং বললের রাতে যে সময় চাঁদ দেখা যায় সসময় দেখা না যাওয়া পর্যন্ত গ্রহনযোগ্য হবে না।

ইমাম নাব্বী এই বর্ননাটিকে সহীহ বলেছেন এবং উসমান ইবনে আফফান (রা:) ও আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) থেকে অনুরুপ বর্নিত আছে বলে উল্লেখ করেছেন। [শারহে মুহাজ্জাব] অপর দিকে উমর (রা:) থেকে জোহরের আগে ও পরে চাঁদ দেখার মধ্যে পার্থক্য করা বর্নিত আছে। কিন্তু ইমাম নাব্বী বলেছেন উক্ত বর্ননার সনদ মুনক্কাতি'।

এ বিষয়ে হাম্বালী মাযহাবের উলামায়ে কিরামের মতামতও একই। তারা বলেন,

وإذا رؤي الهلال نهارا قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المقبلة

যদি দিনের বেলা নতুন চাঁদ দেখা যায় তবে জোহরের সময়ের আগে হোক বা পরে হোক তা আগামী দিনের বলে গন্য হবে। [আল-মুগনী]

সুতরাং এই মাছয়ালাতে বেশিরভাগ উলামায়ে কিরামের মত হলো, দিনের বেলা নতুন চাঁদ দেখা গেলে তা আগামী দিনের চাঁদ বলে গন্য হবে। দলীলের দিক থেকে এটাই বেশি সঠিক বলে প্রমানীত।

মাসআলাটির উপর আমরা একটু গভীর চিন্তা-ভাবনা করবো ইনশা-আল্লাহ।

প্রথমেরই আমাদের চিন্তা করতে হবে শরয়ী বিধানে দিন শুরু হয় কখন থেকে। এ বিষয়ে সঠিক মত হলো দিন শুরু হয় সুবহে সাদিক থেকে। তথা সাহরীর সময় শেষ হওয়ার পর থেকে। আল্লাহ (সুব:) বলেন,

{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ}

কালো সুতা হতে সাদা সুতা প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত খাও এবং পান করো। [বাকারা/১৮৭]

এই আয়াতে সাহরীর শেষ সময়ের বর্ননা দেওয়া হয়েছে। রসুলুল্লাহ (সা:) আয়াতে উল্লেখিত কালো সুতা ও সাদা সুতার ব্যাখ্যায় বলেন,

إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار

এটা হলো রাতের অন্ধকার এবং দিনের আলো। [সহীহ বুখারী ও মুসলিম]

সুতারাং যে আলো উদিত হওয়ার পর সাহরীর সময় শেষ হয় সেটা দিনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বলে প্রমানীত। ইমাম নাব্বী (র:) বলেন,

دليل على أن ما بعد الفجر هو من النهار لا من الليل ولا فاصل بينهما وهذا مذهبنا وبه قال جماهير العلماء

রসুলুল্লাহ (সা:) এর কথার মধ্যমে বোঝা যায় সুবহে সাদিক উদিত হওয়ার পরের সময় দিনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রাতের মধ্যে নয় এবং রাত ও দিনের মধ্যে কোনো বিরতি নেই। এটাই আমাদের মাযহাব এবং বেশিরভাগ উলামায়ে কিরামের মাযহাব। [শারহে মুসলিম]

তাহলে দিনের বেলা যে নতুন চাঁদ দেখা যায় তা আগামী দিনের বলে গন্য করার ব্যাপারে ওলামায়ে কিরাম যে মতামত উল্লেখ করেছেন তার অর্থ হলো, সাহরীর সময় শেষ হওয়ার পর হতে সূর্য ডুবে যাওয়ার আগ পর্যন্ত যে চাঁদ দেখা যাবে তা আগামী রাতের বলে গন্য হবে এবং সূর্য ডুবে যাওয়ার পর হতে সাহরীর সময়ে পূর্ব পর্যন্ত যে চাঁদ দেখা যাবে তা ঐ রাতের বলেই গন্য হবে।

অন্য আরেকটি দৃষ্টিকোন থেকে চিন্তা-ভাবনা করলে একই বিধান পাওয়া যায়।

রসুলুল্লাহ (স:) বলেন,

إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلاَثِينَ يَوْمًا

যখন তোমরা নতুন চাঁদ দেখো তখন রোজা রাখো আবার যখন নতুন চাঁদ দেখো তখন রোজা রাখা বন্ধ করো। যদি আকাশে মেঘ থাকে তবে ত্রিশ দিন রোজা রাখো। [সহীহ মুসলিম]

এখন যদি নতুন চাঁদ সাহরীর সময় শেষ হওয়ার পর দেখা যায় এবং এই চাঁদের উপর নির্ভর করে উক্ত দিন রোজা রাখা হয় তবে চাঁদ দেখার আগেই রোজা শুরু হয়ে যাচ্ছে। যেহেতু রোজা শুরু হয় সাহরীর সময় থেকে। অথচ হাদীসে বলা হচ্ছে নতুন চাঁদ দেখার পর রোজা শুরু করতে পূর্বে নয়। একইভাবে রমজানের শেষে যদি নতুন চাঁদ সাহরীর সময়ের পর দেখা যায় এবং তার উপর নির্ভর করে রোজা ভেঙে ফেলা হয় তবে উক্ত ব্যাক্তি উক্ত দিনের সাহরীর সময় থেকে

রোজা নেই বলে গন্য হবে। অর্থাৎ উক্ত ব্যক্তি চাঁদ দেখা যাওয়ার পূর্বেই রোজা ভেঙে ফেলেছে। অথচ হাদীসে বলা হচ্ছে চাঁদ দেখার পর রোজা ছেড়ে দিতে পূর্বে নয়। সুতারাং এ বিষয়ে সঠিক মত হলো কোনো এলাকার সাহরীর শেষ সময় পার হওয়ার পর যে চাঁদ দেখা গেছে উক্ত চাঁদ দেখে বা উক্ত চাঁদ দেখার খবর শুনে তারা রোজা ও ঈদ পালন করবে না। বরং উক্ত চাঁদ আগামী সময়ের বলে গন্য হবে।

অতএব পৃথিবীর সে স্থানে চাঁদ দেখা যাবে এবং তার খবর পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে পৌঁছাবে সেক্ষেত্রে যখন চাঁদ দেখা গেছে তখন উক্ত এলাকায় যে সময় বিরাজমান থাকবে ঐ এলাকার লোক উক্ত সময়ে স্বচক্ষে চাঁদ দেখলে যে বিধান প্রযোজ্য হতো বলে উলামায়ে কিরাম বর্ননা করেছেন সেই বিধান প্রয়োগ করলে আর কোনো অস্পষ্টতা থাকে না। অর্থাৎ পৃথিবীর কোনো স্থানে যে সময় চাঁদ দেখা যাবে ঐ সময় যেসব স্থানে সাহরীর সময় অবশিষ্ট থাকবে তারা ঐ দিন রোজা রাখবে। আর যেসব স্থানে সাহরীর সময় শেষ হয়ে যাবে তারা পরের দিন থেকে রোজা শুরু করবে আর আল্লাহই ভালো জানেন।

[৩] পূর্বে আমরা বলেছি যে, পৃথিবীর কোথাও চাঁদ দেখা গেলে সমগ্র পৃথিবীবাসীর জন্য তা প্রযোজ্য হবে। এখন যদি কেউ এমন কোনো অঞ্চলে অবস্থান করে যেখানকার বেশিরভাগ মানুষ ভিন্ন মতটির উপর আমল করে। অর্থাৎ স্থানীয়ভাবে চাঁদ দেখে রোজা ও ঈদ পালন করে। তবে প্রথম মতালম্বী ব্যাক্তির কি করা উচিৎ হবে? এই মাসয়ালাটি অন্য আরেকটি মাসয়ালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ন। যে বিষয়ে পূর্ববর্তী উলামায়ে কিরামের মতামত রয়েছে। যদি কোনো ব্যাক্তি একা রমজানের চাঁদ দেখে এবং তার স্বাক্ষ্য অন্যান্য মানুষের নিকট অগ্রহযোগ্য হয় তবে তার বিধান কি হবে সে ব্যাপারে দ্বিমত রয়েছে। ইমাম ইবনে তাইমিয়াকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন,

عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ هِيَ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ عَنْ أَحْمَد : أَحَدُهَا : أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ وَأَنْ يُفْطِرَ سِرًّا وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ . وَالثَّانِي : يَصُومُ وَلَا يُفْطِرُ إلَّا مَعَ النَّاسِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبَ أَحْمَد وَمَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ . الْأَقْوَالِ ؛ وَالثَّالِثُ : يَصُومُ مَعَ النَّاسِ وَيُفْطِرُ مَعَ النَّاسِ وَهَذَا أَظْهَرُ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { صَوْمُكُمْ يَوْمَ تَصُومُونَ وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّونَ}

এ বিষয়ে তিনটি মত রয়েছে যা আহমাদ ইবনে হাম্বাল (র:) হতে বর্নিত আছে। একঃ সে গোপনে রোজা রাখবে এবং রোজা ভাঙবে। এটাই হলো ইমাম শাফেয়ীর মত। দুইঃ সে রোজা রাখবে কিন্তু রোজা ভাঙবে না। [অর্থাৎ রমজানের চাঁদ একা দেখলে একাই রোজা রাখবে কিন্তু শাওয়ালের চাঁদ একা দেখলে রোজা রাখা বন্ধ করবে না।] এটা ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল, ইমাম মালিক ও ইমাম আবু হানীফা (র:) এর প্রশিদ্ধ মত। তিনঃ সে অন্যান্য মানুষের সাথে রোজা রাখবে এবং অন্যান্য মানুষের সাথেই রোজা রাখা বন্ধ করবে। এই মতটিই বেশি স্পষ্ট। কেননা রসুলুল্লাহ (স:) বলেন,

صَوْمُكُمْ يَوْمَ تَصُومُونَ وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّونَ

তোমাদের রোজা হলো যেদিন তোমরা সকলে রোজা রাখো, রোজা ভঙ্গ করতে হবে যেদিন তোমরা রোজা ভঙ্গ করো এবং কোরবানী হলো যেদিন সকলে কোরবানী করে। [মাজমুয়ায়ে ফাতাঈ]

ইবনে তাইমিয়া উল্লেখিত হাদিসটি ইমাম তিরমিযী ও আবু দাউদ বর্ননা করেছেন। ইমাম তিরমিযী হাদিসটি বর্ননা করার পর বলেন,

فسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال إنما معنى هذا أن الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس

হাদীসটির ব্যাখ্যায় কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এর অর্থ হলো রোজা ও ঈদ বেশিরভাগ মানুষের সাথে করতে হবে।

এই হাদীসটির এই ব্যাখ্যায় উপর নির্ভর করে ইমাম ইবনে তাইমিয়া যে ব্যাক্তি একা রমজানের চাঁদ দেখে সে ঐ দিন রোজা রাখবে না এমন মত দিয়েছেন। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল (র:) ও মুহাম্মদ আশ-শায়বানী হতে অনুরূপ বর্ননা উল্লেখিত আছে। তবে ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক ও জমহুর ওলামায়ে কিরাম বলেছেন সে ঐ দিন রোজা রাখবে। ইমাম শাওকানী বলেন,

والخلاف في ذلك للجمهور فقالوا : يتعين عليه حكم نفسه فيما تيقنه

এব্যাপারে জমহুল উলামায়ে কেরাম ভিন্নমত পোষন করেছেন। তারা বলেছেন উক্ত ব্যাক্তি নিশ্চিত যা জানতে পেরেছে তার উপর সেই বিধানই প্রযোজ্য হবে। [অর্থাৎ যেহেতু সে নিজ চোখে চাঁদ দেখেছে অতএব সে রোজা রাখবে।] [নায়লুল আওতার]

এ ব্যাপারে জমহুর উলামায়ে কিরামের মতই সঠিক। কেননা চাঁদ দেখার মাধ্যমেই রোজা সাব্যস্ত হয়। আর যে ব্যাক্তি নিজ চোখে চাঁদ দেখেছে তার নিকট রমজান মাস সাব্যস্ত হয়েছে। অতএব সে রোজা রাখবে এটাই স্বভাবিক। এখন যে ব্যাক্তি সমস্ত পৃথিবীতে রোজা ও ঈদ পালন করার মত অবলম্বন করে এবং ঘটনাক্রমে তার এলাকার বেশিরভাগ লোক ভিন্ন মতের অনুসারী হয় তার ব্যাপারেও একই বিধান প্রযোজ্য হবে। যেহেতু তার মত অনুসারে নিশ্চিতভাবে রমজান মাস প্রমানীত হয়েছে। আর আল্লাহই ভালো জানেন।

এখন যে ব্যাক্তি একা শাওয়াল মাসের তথা ঈদের চাঁদ দেখে সে ঐ দিন রোজা ভাঙবে কিনা এ ব্যাপারে ওলামায়ে কিরামের মত উল্লেখ করে ইবনে তাইমিয়া (র:) বলেন,

فَالْمُنْفَرِدُ بِرُؤْيَةِ هِلَالِ شَوَّالٍ لَا يُفْطِرُ عَلَانِيَةً بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ . إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ يُبِيحُ الْفِطْرَ كَمَرَضٍ وَسَفَرٍ وَهَلْ يُفْطِرُ سِرًّا عَلَى قَوْلَيْنِ لِلْعُلَمَاءِ أَصَحُّهُمَا لَا يُفْطِرُ سِرًّا وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٌ وَأَحْمَد فِي الْمَشْهُورِ فِي مَذْهَبِهِمَا . وَفِيهِمَا قَوْلٌ أَنَّهُ يُفْطِرُ سِرًّا كَالْمَشْهُورِ فِي مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ

যে ব্যাক্তি একা শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখে সে প্রকাশ্যে রোজা ভাঙবে না। এ ব্যাপারে সকল উলামায়ে কিরাম একমত। তবে যদি তার কোনো প্রকাশ্য ওযর থাকে যেমন রোগ বা সফরে থাকা ইত্যাদি সেটা ভিন্ন কথা। কিন্তু এই ব্যাক্তি গোপনে রোজা ভাঙবে কিনা এ ব্যাপারে ওলামায়ে কিরামের দ্বিমত রয়েছে। সঠিক মত হলো সে গোপনেও রোজা ভাঙবে না। এটাই ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদের প্রশিদ্ধ মত। তবে উভয়ের মাযহাবে অন্য একটি মত রয়েছে যে, উক্ত ব্যাক্তি গোপনে রোজা ভঙ্গ করবে। এটা আবু হানীফার মাযহাবের প্রশিদ্ধ মত। [মাযমুয়ায়ে ফাতাওয়া]

সুতারাং একা একজন ব্যাক্তি চাঁদ দেখে প্রকাশ্যে রোজা ভঙ্গ করা বা ঈদের সলাত আদায় করা উলামায়ে কিরামের সর্বসম্মতিক্রমে নিষিদ্ধ। কারন এতে বিভ্রান্তি

ছড়ায় এবং ফিতনার সৃষ্টি হয়। তবে গোপনে রোজা ভঙ্গ করা যাবে কিনা এ ব্যাপারে দ্বিমত আছে। ইবনে তাইমিয়া (র:) এর নিকট সঠিক মত হলো গোপনেও ভঙ্গ না করা। তবে এ বিষয়ে ইমাম শাফেয়ীর মত হলো, সে গোপনে রোজা ভঙ্গ করবে। আলমাওরুদী বলেন,

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَمَنْ رَأَى الْهِلَالَ وَحْدَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الصِّيَامُ ، فَإِنْ رَأَى هِلَالَ شَوَّالٍ حَلَّ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ وَلَا يُعَرِّضُ نَفْسَهُ لِلتُّهْمَةِ بِتَرْكِ فَرْضِ اللَّهِ وَالْعُقُوبَةِ مِنَ السُّلْطَانِ

শাফেয়ী (র:) বলেন, যে একা রমজানের চাঁদ দেখে তার উপর রোজা রাখা ওয়জিব। কিন্তু যদি শাওয়ালের চাঁদ দেখে তবে তার জন্য এমন স্থানে গিয়ে পানাহার করা বৈধ হবে যেখানে তাকে কেউ দেখে না। তার জন্য এমন আচরন করা উচিৎ নয় যাতে মানুষ তাকে ফরয ত্যাগ করেছে বলে অপবাদ দেয় বা সুলতান তাকে সাজা দেয়। [হা-উইল ফাতাওয়া]

“চাঁদ দেখে রোজা রাখো চাঁদ দেখে রোজা ছাড়ো” রসুলুল্লাহ (স:) এর এই কথাটির ব্যাখ্যায় হাফিজ ইবনে হাজার (র:) বলেন,

واستدل به على وجوب الصوم والفطر على من رأى الهلال وحده وأن لم يثبت بقوله وهو قول الأئمةالأربعة في الصوم واختلفوا في الفطر فقال الشافعي يفطر ويخفيه وقال الأكثر يستمر صائما احتياطا

এই হাদিসটি হতে কেউ কেউ দলীল পেশ করেছেন যে, কোনো ব্যাক্তি একা চাঁদ দেখলে তার উপর রোজা রাখা ও রোজা ভঙ্গ করা ফরয। যদিও তার কথা অন্যরা গ্রহন না করে। রোজা রাখার ব্যাপারে চার ইমামের মত এটাই। তবে রোজা ভঙ্গ করার ব্যাপারে তারা দ্বিমত করেছেন। ইমাম শাফায়ী বলছেন, সে রোজা ভঙ্গ করবে এবং গোপন রাখবে। আর বেশিরভাগ আলেম বলেছেন, সতর্কতামূলক রোজা পালন করবে। [ফাতহুল বারী]

যেহেতু রসুলুল্লাহ (স:) ঈদের দিন সওম পালন করতে নিষেধ করেছেন। [সহীহ বুখারী ও মুসলিম] এবং ঈদের দিন সওম পালন করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে আলেমরা ইজমা করেছেন যেমনটি ইবনে কুদামা আল মুগনীতে উল্লেখ করেছেন। সে কারনে এ বিষয়ে ইমাম শাফেয়ীর মতটিই সঠিক মনে হয়। অর্থাৎ একা চাঁদ দেখার পর গোপনে রোজা ভঙ্গ করা। যেহেতু এতে

একদিকে যেমন ফিতনা ও বিভ্রান্তির আসঙ্কা থাকে না অপরদিকে হারাম দিনে রোজা রাখারও প্রয়োজন হচ্ছেনা। আল আল্লাহই ভালো জানেন। তবে এ ক্ষেত্রে যদি বেশিরভাগ ওলামায়ে কিরামের কথা মত রোজা পালন করেন সেটা নিন্দনীয় হবে না, হারাম দিনে রোজা রেখেছে বলেও গন্য হবে না। যেহেতু বিষয়টি নিয়ে শক্ত মতপার্থক্য রয়েছে।

এখন যারা সারা পৃথিবীতে একত্রে রোজা ও ঈদ পালন করার মতে বিশ্বাসী তাদের জন্য উচিৎ যে এলকার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী ভিন্ন মতের উপর রয়েছে সেখানে প্রকাশ্যে ২/১ দিন আগে রোজা ভঙ্গ করে গুটি কয়েক লোক নিয়ে ঈদের জামাত আদায় না করা। যারা এ প্রকৃতির কাজ করে জনমনে বিভ্রান্তি ছড়ায় এরা সকল উলামায়ে কিরামের মতের বিরুদ্ধে কাজ করে। বরং তারা গোপনে রোজা ভঙ্গ করে অন্যান্যদের সহিত ঈদের জামাতে হাজির হলে সেটাই সঠিক হবে। যেহেতু রসুলুল্লাহ (স:) বলেছেন,

وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّونَ

ঈদুর ফিতর হলো যেদিন তোমরা সকলে ঈদুল ফিতর পালন করো এবং কোরবানী হলো যেদিন তোমরা সকলে কোরবানী আদায় করো। [আবু দাউদ]

الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون

রোজা হলো যেদিন তোমরা সকলে রোজা রাখো, রোজা ভঙ্গ করতে হবে যেদিন তোমরা সকলে রোজা ভঙ্গ করো এবং কোরবানী হলো যেদিন সকলে কোরবানী করে। [তিরমিযী]

উপরে আমরা দেখেছি, এই হাদীসের আলোকে ইবনে তাইমিয়া, ইমাম মুহাম্মদ প্রমুখের মত হলো, চাঁদ দেখার পরও রোজা শুরু না করা এবং ঈদ পালন না করা। বরং বেশিরভাগ মানুষের সাথে একত্রে রোজা ও ঈদ পালন করাই তাদের মত। কিন্তু রসুলুল্লাহ (স:) এর পক্ষ থেকে চাঁদ দেখে রোজা পালন করা ও চাঁদ দেখে রোজা ভঙ্গ করার নির্দেশ থাকায় আমরা এ মাসয়ালাতের গোপনে রোজা পালন করা ও রোজা ভঙ্গ করাটাই সঠিক মনে করি। কিন্তু ঈদের সলাত বেশিরভাগ লোকের সাথে একই জামাতে আদায় করার পক্ষে এই হাদীস শক্ত দলীল। যেহেতু এ বিষয়ে

উলামায়ে কিরাম একমত এবং এ ক্ষেত্রে রসুলুল্লাহ (স:) হতে বিপরীত কোনো বর্ননা পাওয়া যায় না। আবু দাউদ বর্নিত একটি হাদীসে এসছে,

أَنَّ رَكْبًا جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ –صلى الله عليه وسلم– يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلاَلَ بِالأَمْسِ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلاَّهُمْ

একদল মুসাফির রসুলুল্লাহ (স:) এক নিকট এসে বলল আমরা গতকাল ঈদের চাঁদ দেখেছি। রসুলুল্লাহ (স:) মানুষকে রোজা ভেঙে ফেলতে এবং আগমীকাল যখন সকাল হবে তখন ঈদের ময়দানে হাজির হতে আদেশ দিলেন। [আবু দাউদ]

এবিষয়ে নাসায়ী ও ইবনে মাযার রেওয়ায়েতে এসেছে একজন আনসারী সাহাবী বলেন,

أغمى علينا هلال شوال . فأصبحنا صياما . فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند النبي صلى الله عليه و سلم أنهم رأوا الهلال بالأمس . فأمرهم رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد

শাওয়াল মাসের চাঁদ মেঘে ঢেকে গেলে আমরা রোজা অবস্থায় সকাল করলাম। দিনের শেষ ভাগে একদল

মুসাফির এসে রসুলুল্লাহ (স:) নিকট বলল তারা গতকাল চাঁদ দেখেছে। রসুলুল্লাহ (স:) তাদের রোজা ভেঙে ফেলতে আদেশ করলেন এবং বললেন আগামীকাল ঈদের ময়দানের উদ্দেশ্যে বের হতে।

এই সমস্ত হাদীস প্রমান করে, ঈদের সলাত কোনো ওযরের কারনে প্রথম দিন আদায় করতে সক্ষক না হলে পরের দিন আদায় করা যায়। এই সমস্ত দলীল প্রমানের কারনে ঈদের সলাত স্থানীয় মুসলিমদের সাথে একত্রে আদায় করাটাই যুক্তিযুক্ত। এর বিপরীত কিছু করা কোনোক্রমেই সঠিক নয়। আর আল্লাহই ভালো জানেন।

অনেকে এখানে তাকবীরে প্রসঙ্গ আনতে পারে। বিভিন্ন হাদীসে বারো তাকবীরে কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে হানাফী মাযহাব অনুসারে ৬ তাকবীরে ঈদের সলাত আদায় করা হয়। অনেকে এই যুক্তিতে প্রচলিত ঈদের জামাত পরিত্যাগ করতে পারনে। বলা বাহুল্য যে, এটি একটি ভুল সিদ্ধান্ত। কারন, প্রথমত ঈদের সলাতের তাকবীরেব ব্যাপারে বেশিরভাগ

আলেমের মতামত হলো এটা আবশ্যক কোনো বিষয় নয়। ইমাম শাওকানী (র:) বলেন,

وقد اختلف في حكم تكبير العيدين فقالت الهادوية إنه فرض وذهب من عداهم إلى أنه سنة لا تبطل الصلاة بتركه عمدا ولا سهوا . قال ابن قدامة : ولا أعلم فيه خلافا قالوا وإن تركه لا يسجد للسهو . وروي عن أبي حنيفة ومالك أنه يسجد للسهو والظاهر عدم وجوب التكبير كما ذهب إليه الجمهور لعدم وجدان دليل يدل عليه

দুই ঈদের তাকবীরের বিধান কী সে ব্যাপারে দ্বিমত হয়েছে। হাদউয়্যাহ্ নামক একটি দল বলেছে এটা ফরজ। তারা ছাড়া অন্যান্যরা বলেছেন এটা সুন্নাত। ইচ্ছাকৃত বা ভূল করে এটা পরিত্যাগ করলে সলাত অগ্রহনযোগ্য হয়না। ইবনে কুদামা বলেন, আমি এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত জানি না। তারা বলেছে যদি এটা পরিত্যাগ করে তবে সাজদা সাহু করবে না। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালিক থেকে বর্নিত আছে এ ক্ষেত্রে সাজদা সাহু করতে হবে। তবে যেটা স্পষ্ট মনে হয় সেটা হলো, ঈদের ছলাতের তাকবীর আবশ্যক নয়। যেমনটি জমহুর ওলামায়ে কিরাম বলেছেন।

যেহেতু এটা আবশ্যক হওয়ার ব্যাপারে কোনো দলীল পাওয়া যায় না। [নায়লুল আওতার]

সুতারাং যে বিষয়টি সলাত শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত নয় এবং সলাতের মধ্যে গুরুত্বপূর্ন কোনো অংশ নয় সেটার কারনে মুসলিমদের জামাত পরিত্যাগ করা সঙ্গত নয়। যেহেতু ইমামের পক্ষ হতে সুন্নাত পরিত্যাগ করার কারনে সলাতের জামাত হতে দূরে থাকা সঠিক নয়। এ বিষয়ে দলীল হলো আবু সাঈদ আল খুদরী (র:) হতে সহীহ মুসলিমে বর্নিত একটি হাদীস যেখানে উল্লেখ আছে মারওয়ান ইবনে হাকাম ঈদের সলাতের পূর্বে খুতবা দেওয়ার রেওয়াজ চালু করে। অথচ রসুলুল্লাহ (স) এর সুন্নাত ছিলো ঈদের সলাতের পরে খুতবা দেওয়া। একজন নেককার ব্যাক্তি মারওয়ান ইবনে হাকামের মুখের সামনে এর প্রতিবাদ করলে আবু সাঈদ আল খুদরী (রা:) তাকে সমর্থন করেন। এরপরও মারওয়ান ইবনে হাকাম ঈদের সলাতের পূর্বেই খুতবা দেওয়া অব্যাহত রাখে। তার এ কাজ সুন্নাতে বিপরীত হওয়া সত্বেও আবু সাঈদ আল খুদরী (রা:) বা অন্য কোনো সাহাবা তার পিছনে ঈদের সলাত আদায় করা পরিত্যাগ করেন নি।

এটা সেক্ষেত্রে যখন ইমাম ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো সুন্নাত পরিত্যাগ করে। অর্থাৎ তখনও তার পিছনে জামাতে সলাত আদায় করতে হবে। কিন্তু ঈদের তাকবীরে ক্ষেত্রে এমন ঘটনা ঘটে না। হানাফী মাযহাবের উলামায়ে কিরাম ইচ্ছাকৃতভাবে সুন্নাতের বিপরীত আমল করেন এমন নয়। বরং ঈদের তাকবীরের সংখ্যা কতো সে ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরাম ও পরবর্তী উলামায়ে কিরামের মধ্যে যে দ্বিমত ছিল সেটার কারনেই তারা ১২ তাকবীরের পরিবর্তে ৬ তাকবীরে ঈদের সলাত আদায় করে থাকেন। এ বিষয়ে সাহাবায়ে কিরাম হতে বিভিন্নরকম বর্ননা আছে। নায়লুল আওতারে ইমাম আশ-শাওকানী এ বিষয়ে ১০ টি মত উল্লেখ করেছেন। ৬ তাকবীরের পক্ষেও বেশ কিছু বর্ননা রয়েছে।

ইমাম তিবরানী বর্ননা করেন,

كان عبد الله بن مسعود يكبر في الأضحى والفطر تسعا تسعا يبدا فيكبر أربعا ثم يقرأ ثم يكبر واحدة فيركع بها ثم يقوم في الركعة الآخرة فيبدأ فيقرأ ثم يكبر أربعا يركع بإحداهن

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরে নয়টি করে তাকবীর দিতেন। তিনি শুরুতে [তাকবীরে তাহরীমা সহ] চারটি তাকবীর দিতেন। এরপর কিরাত পড়তেন। এরপর একটি তাকবীর বলে রুকু করতেন। এরপর পরের রাকাতের জন্য উঠে দাড়াতেন এবং শুরুতেই কিরাত পড়তেন। তারপর চারটি তাকবীর দিতেন। তার মধ্যে একটির মাধ্যমে রুকু করতেন। [মু'জামে কাবীর]

এই রেওয়ায়েতটি সম্পর্কে নুরুদ্দীন আল হায়ছামী মাজমায়ে ঝাওয়ায়েদে বলেন,

ورجاله ثقات

এর রাবীরা বিশ্বস্থ।

অন্য একটি হাদীসে এসেছে,

أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ سَأَلَ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِىَّ وَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يُكَبِّرُ فِى الأَضْحَى وَالْفِطْرِ فَقَالَ أَبُو مُوسَى كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا تَكْبِيرَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ. فَقَالَ حُذَيْفَةُ صَدَقَ. فَقَالَ أَبُو مُوسَى كَذَلِكَ كُنْتُ أُكَبِّرُ فِى الْبَصْرَةِ حَيْثُ كُنْتُ عَلَيْهِمْ

সাঈদ ইবনে আস আবু মুসা আল আশয়ারী (রা:) তে প্রশ্ন করলো রসুলুল্লাহ (স:) ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহাতে কেমন তাকবীর দিতেন? তখন সেখানে হুজায়ফা (রা) হাজির ছিলেন। আবু মুসা (রা:) বলেলেন, তিনি যেভাবে জানাযার নামাযে তাকবীর দিতেন সেভাবে চারটি তাকবীর দিতেন। আবু হুযাইফা (রা:) তখন বললেন, তিনি ঠিকই বলেছেন। আবু মুসা (রা:) বললেন, আমি যখন বসরাতে ছিলাম তখন তাদের ইমাম হয়ে এভাবেই তাকবীর দিতাম। [আবু দাউদ]

এই হাদীসটিকে আলবানী হাসান সহীহ বলেছেন। ওলামায়ে কিরাম হাদীসটিতে উভয় রাকাতে চার তাকবীর দেওয়ার পদ্ধতি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) এর হাদীসে বর্নিত পদ্ধতির অনুরূপ বলে ব্যাখ্যা করেছেন। অর্থাৎ প্রথম রাকাতে কিরাতের পূর্বে তাকবীরে তাহরীমাসহ চারটি তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকাতে কিরাতের পর রুকুর তাকবীরসহ চারটি তাকবীর। [আউনুল মাবুদ]

আমাদের নিকট এ বিষয়ে ১২ তাকবীরই সঠিক। কেননা ১২ তাকবীরে পক্ষের হাদীস সংখ্যা ও সনদের দিক হতে বেশি গ্রহনযোগ্য। কিন্তু এটা ভুলে গেলে চলবে না যে, ৬ তাকবীরের পক্ষে বিভিন্ন বর্ননা রয়েছে। যেগুলো কোনো কোনো মুহাদ্দিসের দৃষ্টিতে সহীহ হিসেবে প্রমানীত এবং হানাফী মাযহাবের বহুসংখ্যক উলামায়ে কিরাম ৬ তাকবীরের পক্ষে রয়েছেন। সুতারাং বিষয়টিকে ইখতিলাফী মাসায়েল সমূহের মধ্যেই গন্য করতে হবে। আর এ বিষয়ে সকর উলামায়ে কিরাম একমত যে, ইজতিহাদী মাসায়েল সমুহতে ভিন্নমত পোষনকারী ব্যাক্তি ইমাম হলে অন্য মতের লোকেরা তার পিছনে সলাত আদায় করবে। সাহাবায়ে কিরাম (রা:) ও তাদের পরবর্তী তাবেঈন ও তাবা' তাবেঈদের পন্থা ছিলো এটাই। আহমাদ ইবনে হাম্বাল (র:) নাক দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়লে ওযু ফরয হয় বলে মনে করতেন। এবিষয়ে ইমাম মালিক, সাঈদ ইবনে মুসায়্যাব ইত্যাদি ওলামায়ে কিরামের দ্বিমত ছিলো। একাবার আহমাদ ইবনে হাম্বালকে প্রশ্ন করা হলো যদি এমন ব্যাক্তি ইমাম হয় যার নাক দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ে কিন্তু সে ওযু করে না। [অর্থাৎ উযু করা

জরুরী মনে করে না।] তবে কি আপনি তার পিছনে সলাত আদায় করবেন? তিনি বললেন, আমি কিভাবে ইমাম মালিক, সাঈদ ইবনে মুসায়্যাবের পিছনে সলাত আদায় করা পরিত্যাগ করতে পারি। [মাযমুয়ায়ে ফাতাওয়া]

এ মাসয়ালাটিকে ইমাম ইবনে তাইমিয়া দুটিভাগে ভাগ করেছেন।

[ক] যদি ইমাম এমন কোনো কাজ না করে যাতে মুক্তাদির দৃষ্টিতে সলাত বাতিল হয়ে যায়। তিনি বলেছেন, এ ক্ষেত্রে পর্ববর্তী সকল উলামায়ে কিরাম মুক্তাদীর সলাত শুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে একমত। এ বিষয়ে যারা দ্বিমত পোষন করেছে ইমাম ইবনে তাইমিয়া তাদের বিদয়াতী বলে আখ্যায়িত করেছেন। তার ভাষায়,

وَقَائِلُ هَذَا الْقَوْلِ إِلَى أَنْ يُسْتَتَابَ كَمَا يُسْتَتَابُ أَهْلُ الْبِدَعِ أَحْوَجُ مِنْهُ إِلَى أَنْ يَعْتَدَّ بِخِلَافِهِ

এ মতের লোকদের মতপার্থক্য গ্রহন করা তো দুরের কথা বরং বিদাতীদের যেমন তওবা পড়ানো হয় এদেরও সেভাবে তওবা পড়ানো উচিৎ। [মাযমুয়ায়ে ফাতাওয়া]

[খ] যদি ইমাম এমন কোনো কাজ করে যা মুক্তাদীর দৃষ্টিতে নামায ভঙ্গ হওয়ার কারন। হানাফী মাযহাবের একজন ইমাম হয়তো সুন্নাত মনে করার কারনে বিসমিল্লাহ পাঠ করলেন না। কিন্তু তার পিছনে শাফেয়ী মাজহাবের একজন মুছল্লী রয়েছে যিনি বিসমিল্লাহ পাঠ করা ফরজ মনে করেন। এই ক্ষত্রে মুক্তাদীর সলাত শুদ্ধ হবে কিনা সে বিষয়ে মতপর্থক্য আছে। কিন্তু জমহুর উলামায়ে কিরামের মত হলো পূর্বের মতোই এ ক্ষত্রে মুক্তাদীর সলাত শুদ্ধ বলে গন্য হবে। [মাযমুয়ায়ে ফাতাওয়া]

ঈদের সলাতের তাকবীরের ব্যাপরটি প্রথম পর্যায়ে পড়ে যেহেতু সঠিক মতে এটা সলাত শুদ্ধ হওয়ার জন্য শুদ্ধ নয়। সুতরাং ১২ তাকবীরের পরিবর্তে ৬ তাকবীর দেওয়ার কারনে হানাফী মাযহাব মতালম্বী ইমামের

পিছনে জামাতে ঈদের সলাত পরিত্যাগ করা আলেমদের সর্বসম্মতিক্রমে ভ্রান্ত এবং বিদয়াত।

هذا ما عندى والعلم عند الله

تمت ولله الحمد